রবীন্দ্রমননে মৃত্যুচেতনার উত্তরণ

পাপিয়া গুপ্ত
শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাংশ : আজন্ম বিশ্বপ্রকৃতির কোলে লালিত রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন বিশ্ব জাগতিক রহস্য উদঘাটনের প্রতি আগ্রহী। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের মতো অতি বাস্তব ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে করে তুলেছিল এক অনন্য দার্শনিক চিন্তার অধিকারী। ফলে দেখা যায় বাল্যকালের যে মৃত্যু-অভিজ্ঞতা কবির মনে তেমন কোনো রেখাপাত করতে পারেনি, কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে অনুভূত সেই মৃত্যু-অভিজ্ঞতাই জীবনে এনেছিল দুঃখ ও বিরহ যন্ত্রণার হাহাকার। আবার পরিণত বয়সে উপলব্ধ একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যু অভিজ্ঞতা কবিকে করে তুলেছিল শান্ত-সংহত ও স্বাভাবিক। কবি জীবনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে উপলব্ধ বিভিন্ন চেতনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু চেতনাও ক্রমশঃ দার্শনিক পরিণতি লাভ করেছিল। তাঁর চিন্তায় মৃত্যু পরিণত হয়েছিল অমৃতে। দুঃখ পরিণত হয়েছিল আনন্দে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপলব্ধ হয়েছিল মুক্তির স্বাদ।

বীজশব্দ: বিশ্বপ্রকৃতি, আত্মা, বিশ্বাত্মা, পরমাত্মা, মৃত্যু, মুক্তি, অমৃত, অনন্ত-আনন্দ।

বিশ্বকবির শিশুকাল অতিবাহিত হয়েছিল নেহাতই সমাদরে, অনাদরে, অযত্নে, অসম্মানে।[১] একান্নবর্তী পরিবারে অসংখ্য সন্তান সন্ততিরা সে যুগে জমিদারী রাজবাড়ীতে লালিত হত ভৃত্যদের তদারকিতে। তাই সেই ধরনের শিশু পালন আর সন্তান পালনের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য তা হয়ত বলার অপেক্ষা রাখে না। শিশু পালনে থাকে সোহাগের পরিবর্তে শাসনেরই আধিক্য। ফলে কবির শৈশব কেটেছে এক অতি শৃঙ্খল পরায়ন সংসার এবং ইঁট কাঠ পাথরে তৈরী এক শহুরে খাঁচায় যেখানে অখন্ড আকাশ খন্ড খন্ড হয়ে ধরা দিতো এক একটা জানলা নামক গরাদে, কখনো কখনো মুক্ত বাতাস প্রবেশের অধিকার পেতনা বদ্ধ ঘরে, এক চিলতে রোদ্দুরেই হয়ত অবগাহন সারতে হতো, আর ছিল শাসনের লক্ষণ রেখা যা পার হলেই সংসারে ঘটে যেতো অনর্থ। সংসারের প্রতিটি মানুষ এতই কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন যে শিশুদের প্রতি তাঁদের দায়িত্বগুলি পালন করতেন সংসারের ভৃত্য, মাস্টারমশাই, গুরুজি, শিক্ষক প্রভৃতিরা। নিয়ম মেনে, ঘড়ি ধরে সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত হত। ফলে কবি ছিলেন বাইরে থেকে বহু মানুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত কিন্তু ভিতরে একেবারেই একা। এমতাবস্থায় তিনি যখন বাল্য বয়সে প্রথম চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে যান সেখানে তিনি প্রথম আদর পান বিশ্ব প্রকৃতির কাছ থেকে। অজস্র মানুষের ভিড়ে সেদিন তাঁকে কেউ অভ্যর্থনা জানায়নি। অথচ প্রতিদিন তাঁকে জানাতো প্রাণভরা মুক্ত বাতাস তাঁর শরীর শীতল করত, পবিত্র গঙ্গার জলধারা দিত তাঁর পা ধুইয়ে, শ্যামল বনানী দিত তাঁকে শান্তির আশ্রয়। সেই অতিথি বৎসল প্রকৃতি সেদিন বালক রবীন্দ্রনাথকে বাঁশি বাজানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আর রবীন্দ্রনাথ সেই বাঁশির সুরে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর মানসী কবিতাকে। সেই বিশ্ব প্রকৃতির খেলাঘরে বসে তিনি যে কাব্য যে গীতি, যে সুর আজীবন সৃষ্টি করে গেছেন তার প্রতিটি অঙ্গে আছে বিশ্বপ্রেম, মানবচেতনা, মহামানবের সঙ্গে একাত্মতার বাণী যা তাঁকে কবি থেকে বিশ্বকবিতে উন্নীত করেছে। তিনি একমাত্র ভালোবাসতের তাঁর সৃষ্টিকর্মকে। তাঁর না ছিল বিষয়ের প্রতি আসক্তি, না ছিল পার্থিব বস্তুতে আসক্তি। এমন

কি পারিবারিক স্নেহবন্ধনও তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনি। একের পর এক প্রিয়জনের অকালমৃত্যুতেও অবিচল থাকা তারই সাক্ষ্য বহন করে। যত বড় অঘটনই ঘটে যাক না কেন বিশ্বপ্রকৃতিতে যেমন তার কোনো প্রভাব পড়ে না কবি প্রকৃতিও সেই রকম যেখানে কোনো ঘটনাই রেখাপাত করেনা। তবে কি কবি ছিলেন হৃদয়হীন ? কখনোই তা হতে পারে না। তিনি যদি হৃদয়হীন, চিত্তহীন হবেন তাহলে সংসারে এত প্রেম, এত রস, এত সুধা বর্ষণ করতো কে ? কবি তাঁর শোক, তাঁর ব্যথা, তাঁর নয়নবারি রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টি কর্মে, কাব্যে কাব্যে, গানে গানে।গমন দণ্ডন্সসঙ তাঁর মতো মহাপুরুষই পারেন প্রেম বিরহ- সুখ-দুঃখ- বেদনার অনুভূতি মিশ্রিত 'গীতবিতান' সৃষ্টি করতে।[২] তিনি মরমের দীর্ঘশ্বাস মরমে রোধ করতে জানতেন, পাছে কেউ দেখে ফেলে, তাই তিনি গোপনে অশ্রু ফেলে মুছে ফেলতেন।

কবি জননী সারদাদেবীর যখন মৃত্যু হয় তখন কবির বয়স মাত্র চোদ্দ (১২৮১)। সেই বয়সে তিনি মৃতা মায়ের মুখে দেখে ছিলেন প্রশান্তির ছায়া। তার দশ বছর পর (১২৯১) তাঁর বাল্যকালের সঙ্গী তথা সংসার ও সাহিত্য জীবনের পূর্ণ নির্ভর পরমাত্মীয়া নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে যে প্রচন্ড আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তার ফলেই তিনি জীবন থেকে মুক্তির জগতে প্রথম প্রবেশ লাভ করেন। তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে ১৯১৭, ২২ শে জুন এর চিঠিতে লিখেছেন, '.... তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচ থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূণ্য হল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল। সেই শূণ্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তারপরে সেই প্রচন্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে।'[৩] নতুন বৌঠানের সঙ্গে আরেকবার দেখা হবার আশায় তিনি রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে কবি - অজস্র গান - কবিতা রচনা করেছেন যা বিরহ - বেদনা - ভালবাসাকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হয়েছে। অতএব কবিগুরুকে আমরা কখনোই হৃদয়হীন বলতে পারিনা। রবীন্দ্র গবেষক অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য তাঁর রচিত 'কবির কান্না' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, সমগ্র গীতবিতান জুড়ে কবির যে বিরামহীন ক্রন্দন তা শুধু গান বা কবিতা সৃষ্টির দাবীতে নয় তা কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত শরীরী কান্না। সংসার জীবনে তিনি তা আড়াল করতে পারলেও সাহিত্য রচনায় সেই জলের জোয়ারকে বাঁধ দিয়ে রোধ করতে পারেননি।

বিশ্বপ্রকৃতি ছিল কবি রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সঙ্গী, কবি প্রকৃতির অন্তরের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গতার পরিচয় আমরা তাঁর অজস্র লেখনীতে পেয়ে থাকি। কিন্তু এই অন্তর বাহিরের নিবিড় সম্পর্ক কবি জীবনে শৈশবে, যৌবনে বা বার্ধক্যে উপস্থিত থাকলেও তা কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধিকালে হঠাৎ করে ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি নিজেই লিখে ছিলেন, একসময় বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং চেতনা তখন তাঁর নিজের ভিতরেই আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সামঞ্জস্যটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।[৪] আর এর জন্য অবশ্যই দায়ী ছিল কবির হৃদয়বত্তা তথা চিত্তচাঞ্চল্য। কৈশোরের হৃদয় তখন ভালোবাসার আগুনে জর্জরিত, সর্বদা না পাওয়ার হতাশায় ব্যাকুল। অথচ সে বেদনা অনুভূতি বা প্রেমানুভূতি সবই গোপন করার তীব্র বাসনাও হৃদয়ের ধর্ম। এই বাসনা থেকেই সৃষ্টি হল একের পর এক কাব্য, গীতি, নাটক প্রভৃতি। তিনি 'বনফুল' কাব্যে লিখেছেন –

"ও কথা শুধাতে আছে ? ও কথা ভাবিতে আছে ?

তবুও শুধাও যদি দিব না উত্তর ! . . .
হৃদয়ে যা লিখা আছে দেখাবো না কারও কাছে,
হৃদয়ে লুকানো রবে আমরণ কাল ![৫]

এই কাব্য উপন্যাসে নীরদ ও কমলার ব্যর্থ প্রেম থেকে জাত ব্যাকুলতা এবং অবশেষে নীরদের বিয়োগ ব্যথার বর্ণনা কবির লেখনীতে বাস্তব হয়ে উঠেছে। 'কবি কাহিনী'তেও রবীন্দ্রনাথের কলমে মূর্ত হয়ে উঠেছে নায়ক কবির হতাশা, শোক, মিলনের প্রতি ব্যর্থ প্রয়াস।[৬]

'ভগ্নহৃদয়'[৭] প্রভৃতি কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র হৃদয়ের পাওয়া না পাওয়া, প্রেম-বিরহ, হাসি - কান্নার মায়াজাল বিস্তার করেছেন। প্রেমাস্পদের মৃত্যু নায়ক-নায়িকার জীবনে এনেছে হাহাকার অশ্রুবারি প্লাবিত করেছে হৃদয়কে, না পাওয়ার অতৃপ্তি মনকে করেছে আকুল। এ সবই কবির হৃদয়ানুভূতি জাত। মৃত্যু তখনও কবির কাছে এক হৃদয় বিদারক অনুভূতি। 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যেও শেষ কবিতা 'উপহার'[৮] এ কবি তাঁর থেকে দূরে চলে যাওয়া অভিমানী সখীর সঙ্গে মিলনে অস্থির, আগ্রহী। বিরহ বিচ্ছেদ, মৃত্যুকে যেন তিনি তখন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। কবি স্বীকার করেছেন তাঁর কৈশোরকালে লিখিত কাব্যগুলির সময় তিনি হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে হারিয়ে গেছিলেন, এসময় তিনি হৃদয়ের মধ্যেই স্থিত ছিলেন, বাইরের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল না। এক অকারণ আবেগ ও লক্ষ্যহীন আশঙ্কার মধ্যে তাঁর কল্পনা নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে ভ্রমণ করছিল। এসময় বাস্তব পৃথিবী থেকে তিনি অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু যে অতিবাস্তব চেতনা কবির অনুভূতিকে এক নূতন মহিমা দান করেছে তা থেকে তিনি কখনোই দূরে সরে যেতে পারেননি এবং তা হল মৃত্যু চেতনা। এই সময়ে রচিত কাব্য উপন্যাসগুলিতে বিষাদ,বিরহ, বিচ্ছেদের তীব্র অনুভূতি থেকে মুক্তি পেতে যেমন তাঁর রচনার কুশীলবদের মৃত্যুর প্রতি আকাঙ্খা উপস্থাপন করেছেন কবি, তেমনই কাহিনীর প্রয়োজনেও তিনি অবতারনা করেছেন মৃত্যুর মতো অতিবাস্তব ঘটনারও। 'কবিকাহিনী'র নলিনীর মৃত্যু, 'বনফুল'-এর নীরদের মৃত্যু তারই প্রমাণ। আবার 'ভগ্নতরী'তে শোকাতুরা ললিতাও নিজের মৃত্যু কামনা করে বলছেন –

"শুধু শ্রান্তি, শুধু শ্রান্তি - আর কিছু, কিছু নহে -
নহে তৃষ্ণা, নহে শোক, নহে ঘৃণা, ভালোবাসা –
দারুণ শ্রান্তির পরে আসে যে দারুণ ঘুম
সেই ঘুম ঘুমাইব - আর কোনো নাই আশা।"[৯]

অপরদিকে 'বনফুল' কাব্যে পিতৃশোকে আকুল, নীরদ ও বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার কমলা সেও তার মৃত্যু কামনা করে এবং শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করে। আবার 'কবিকাহিনী'র নায়ক কবি পৃথিবী ভ্রমণ করে এসে যখন তার প্রণয়ী নলিনীর জীবনহীন জড় দেহ দেখতে পায় তখন সে শোকগ্রস্থ, হতাশ হয়ে পড়ে। তবু তারই মধ্যে সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে প্রতিশ্রুত চুম্বনচিহ্ন তার অধরে এঁকে দেয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক প্রেমিকার চিতাতেও ভগ্নহৃদয় বাসর শয্যা রচনা করতে পিছপা হননি। অর্থাৎ অবৈধ মিলনের চরম আশ্রয়স্থল হিসাবে তিনি মৃত্যুকেই নির্বাচন করেছিলেন - এই স্তরে মৃত্যু কবির কাছে একান্তই অনভিপ্রেত। তবু বিরহ বিচ্ছেদ বেদনার তীব্রতা থেকে মুক্তি পেতে মিলন পিপাসা নিবারণ করতে মৃত্যুই শ্রেয় বলে

কবির কাছে মনে হয়েছে। সেই হৃদয়ানুভূতিই তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর কৈশোর বা সদ্য প্রাপ্ত যৌবনের দিনগুলির সৃষ্টিকর্মে। এই সৃষ্টিকর্ম থেকেই অনুমান করা যায় যে কবিচিত্রে মৃত্যু চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এই পর্বেই।

কবির এই স্তরের মৃত্যু চেতনা কবির হৃদয়কে টেনে নিয়ে গেল এক অসীম অন্ধকারময় জগতে যেখানে একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা অপরিসীম শূণ্যতাই হল কবির অকান্ত দোসর। বিশ্ব প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, জগৎ সংসার থেকে বিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে ছিলেন একান্ত ভাবে হৃদয়াবিষ্ট - বিচরণ করছিলেন একান্তভাবে সৃষ্ট কাল্পনিক জগতে যা তাঁর বয়সের স্বভাবজাত ধর্মকেই প্রকাশ করে। কিন্তু কবি ছিলেন তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত সন্তান, যিনি রবি কে গড়ে তুলেছেন উপিনষদীয় পবিত্র বাতাবরণের মধ্যে দিয়ে। অধ্যাত্ম শিক্ষায় শিক্ষিত কবি শিখেছিলেন ব্যক্তিপ্রেম নয় বিশ্বপ্রেমই জীবনের মূলমন্ত্র। ব্যাক্তিমানবেক অতিক্রম করে মহামানবকে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই মরজলালকে অতিক্রম করা যায়। শূণ্যতার অন্তরালে আছে পূর্ণতা। আর অন্ধকার নয় আলোই আমাদের জীবনের উৎস। যে জ্যোতির্ময় তেজ পুরুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের স্রষ্টা, আমরা তারই সন্তান, আমাদের মধ্যেই তিনি অবস্থান করেন। তাই ব্যবহারিক জগৎ অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছতে মহামানবের জগতে, একাত্ম হতে হবে তাঁর সঙ্গে, বিসর্জন দিতে হবে ভ্রান্ত অহং কে। 'ছোট আমি' নয় 'বড় আমি' হবে আমাদের কাঙ্খিত ঐশ্বর্য। আমাদের অহং আমাদের করে তোলে আত্মকেন্দ্রিক, অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন। অসীম অনন্ত আনন্দ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে। অহং এর আবরণ খসে পড়লে তবেই আমরা সত্য প্রেমও আনন্দময় জ্যোতির্ময় পুরুষের সান্নিধ্য পাব। তাই 'জন্মদিনে' কবিতায় কবির আকূল প্রার্থনা–

"হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে মৃত্যুর অতীত।"[১০]

আমাদের আত্মার মহিমাকে যে হতাশ, অবসাদগ্রস্ত, ম্লান, জর্জরিত তমসাচ্ছন্ন করে রাখে তাকে দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি চেয়েছেন মৃত্যুকে অতিক্রম করতে, জয় করতে। অবশেষে একদিন তিনি সত্যিই গুহার অন্ধকারে সেই জ্যোতির্ময় সবিতার স্পর্শ তাঁর প্রাণে অনুভব করলেন, তাঁর চারপাশে রচিত কারাগার ভঙ্গ করে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে, মানব প্রকৃতির সাথে যোগ স্থাপন করলেন, একাত্ম হলেন।[৪] বিশ্বসংসারের প্রতি প্রেম বন্ধনে যুক্ত হলেন-উপলব্ধি করলেন হৃদয়ের গান, জীবনের গানের মধ্যেই প্রকৃত পূর্ণতা। প্রেম বিতরণ করতে পারে বলেই মানুষ মহান। এই আত্ম বোধের মধ্য দিয়ে কবি চিত্ত পরিণত হতে থাকল, কাল্পনিক জগৎ থেকে তার উত্তরণ ঘটলো আধ্যাত্মকি জগতে য 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনার যে স্তরে কবির গানের সুর একাকীত্ব আর অনন্ত অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল –

"আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একলা বসিয়া
একে একে সুর গুলি অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।"[১১]

'প্রভাত সংগীত' স্তরে তিনি সেই একাকীত্ব আর অনন্ত অন্ধকারকে খন্ড খন্ড করে লিখলেন,

"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে - প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"[১২]

একই সঙ্গে তিনি 'প্রভাত উৎসবে' এ লিখলেন -

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"[১৩]

অর্থাৎ কবির হৃদয় এই সময় তাঁর বিষাদগ্রস্ত কাল্পনিক জগৎ থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পেয়েছে এবং বিশ্বসংসারের সাথে তাঁর হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপনে সমর্থ হয়েছে। আর এই ঘটনা হঠাৎই কবির জীবনে ঘটেছে বলে তিনি তাঁর প্রাণের আবেগ, প্রাণের বাসনা রোধ করতে পারেননি। তাঁর প্রাণ মেতে উঠেছে সদ্য উদিত রবির স্পর্শে, তিনি হতাশা, বিষাদের অন্ধকার কারাগার ভেঙ্গে মহাবিশ্বের মহাসাগরে আনন্দময় গান তাঁর কণ্ঠে রবিরশ্মির আলোক প্লাবিত করলো তাঁর জীবনকে। সার্থক হয়ে উঠলো উপনিষদের সেই বাণী 'তমসো মা জ্যোতির্গময়...।'

এরপরে কবি যৌবনকালে প্রবেশ করলেন কঠিন ও কোমল সংসার জগতে। বৈবাহিক জীবনের রূপ - রস - গন্ধ - সৌন্দর্যের লালিমায় অবগাহন করে কবি 'পুরাতন' কে বিদায় জানিয়ে লিখলেন–

"হেথা হতে যাও পুরাতন,
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে,
আবার বাজিছে বাঁশি
আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস রয়েছে।"[১৪]

তিনি "গীতোচ্ছাস" – এ লিখেছেন –

"নীরব বাঁশিখানি বেজেছে আবার,
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত কানন মাঝে বসন্তসমীরে।"[১৫]

কিন্তু এই সব লেখনীর মধ্যেও কবি হৃদয়ের মধ্যে কোথাও যেন একটা আধ্যাত্মিক চেতনার অনন্ত কল্পধারা প্রবাহিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ ঐ কাব্য গ্রন্থেরই 'মোহ' কবিতায় তিনি লিখেছেন -

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে - কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,

মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।"[১৬]

'মরীচিকা' কাব্যে তিনি আশঙ্কা করেছেন - স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে'।[১৫] অতএব দোঁহে নয় মানবের সাথে সুখে দুঃখে একসাথে থেকে হাসি কান্না ভাগ করে নেওয়াই জীবন। আসলে 'ছোট আমি'র আবরণ ছিঁড়ে 'বড়ো আমি'র সঙ্গে মহামিলনের যে প্রয়াস তা কবি চিত্তে শৈশবকাল থেকেই গ্রথিত হয়েছিল মহর্ষি পিতার সাহচর্যে। তাই রূঢ় বাস্তবকে স্বীকার করেও তার অন্তরালে কবির নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক তথা ঈশ্বর চিন্তা জীবনের প্রতিটি পর্বেই প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। প্রকৃতিবাদ, মানবতাবাদ, ভক্তিবাদ, আধ্যাত্মবাদের প্রতি তাঁর যে প্রগাঢ় অনুরাগ আজীবন তিনি তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। কবির লেখনীতে অহং তথা 'ছোট আমি', 'আমি' তে আর 'বড়ো আমি' - 'তুমি' তে পরিণত হয়েছিল। সেই 'তুমি' কখনো কবির কাছে রাজা, কখনো সখা, কখনো প্রিয়া বা প্রভু রূপে ধরা দিয়েছে।

কবির মৃত্যুচিন্তা যেমন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ তেমনই তাঁর দার্শনিকতা ও সৃজনশক্তির দ্বারা ঐশ্বর্যমন্ডিত। তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মের মধ্যে পাওয়া যায় মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনার পরিচয় যা তাকে করে তুলেছে মহিমান্বিত। তিনি বিশ্বাস করতেন 'নহন্যতে হন্যমানে শরীরে" অর্থাৎ শরীরের বিনাশ ঘটলেও আত্মার কোন বিনাশ নেই। আত্মা পুরাতন জীর্ন বসন ত্যাগ করে নূতন বসন তথা দেহ ধারণ করে। 'আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে' অর্থাৎ আত্মার জন্ম বা মৃত্যু হয় না। কবির জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় তাঁর মা সারদাদেবীর মৃত্যুতে যখন কবির বয়স চোদ্দ। অপরিণত বয়সের সেই অর্থহীন অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে তেমন কোন গভীর চিহ্ন আঁকতে না পারলেও মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা ও একপ্রকারের শূণ্যতা তাঁকে সাময়িক ভাবে পীড়া দিয়েছিল। তিনি নিজেই তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে স্বীকার করেছেন যে শিশুকালের প্রবল প্রাণশক্তি কোনো আঘাতকেই গভীরভাবে গ্রহণ করে না মনে গভীর রেখাপাতও করে না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই মাতৃশোক কবির জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল। কিন্তু মায়ের মৃত মুখের মধ্যে তিনি সেই বয়সেই মৃত্যুর এক মধুর রূপ দেখতে পেয়েছিলেন, মৃত মায়ের প্রশান্তিময় মুখচ্ছবি মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁকে সন্দিহান করে তুলেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতই যেন তাঁর মা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতলোকে গমন করেছেন।

পরবর্তীকালে কবির বয়স যখন চল্লিশ তখন তাঁর পরমাত্মীয়, সাহিত্যচর্চার সাথী, সংসার জীবনে পরমনির্ভরযোগ্য আশ্রয় তাঁর পরমপ্রিয় নূতন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। বয়সে প্রায় সমসাময়িক কবি ও কাদম্বরী দেবীর মানসিক বোঝাপড়া ছিল অসাধারণ। এইরকম সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করে যখন কাদম্বরী দেবী মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে অমৃতলোকে যাত্রা করেন তখনই কবি মৃত্যুর স্থায়ী রূপটি প্রথম উপলব্ধি করেন। তিনি পরিচিত হন মৃত্যুর প্রকৃত অর্থের সাথে। শিশু বয়সে মায়ের মতো পরমতম আত্মীয়ার মৃত্যুও জীবন পাশ কাটিয়ে যেতে পারে কিন্তু বেশি বয়সের অনুভূতিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক তাঁর বুকে চরম আঘাত করেছিল। বাল্যকালের যে মৃত্যু কবি মনে প্রশান্ত মনোহর সুখ সুপ্তির অনুভূতির সঞ্চার করেছিল যৌবনকালে সেই মৃত্যু কবি মনে সঞ্চার করেছিল এক গভীর শূণ্যতা। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার চেয়েও অতি বাস্তব অতি সত্য বলে অনুভূত হত যাকে তার অকস্মাৎ অন্তর্ধান কবির হৃদয়কে এক অতল অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিল। কিন্তু কবির দার্শনিক মন অনস্তিত্বের অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল অস্তিত্বের আলো। তিনি অন্ধকারকে অতিক্রম করার পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

এই সময় কবির জীবনে এক অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, যাকে তিনি স্বয়ং 'সৃষ্টিছাড়া' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮] এসময় তাঁর আচার ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছেদ, লোক লৌকিকতা, আহার বিহার সব কিছুতেই তাঁর ঐ সৃষ্টিছাড়া মনোভাব প্রকাশ পেত। অর্থাৎ এই বিষয়গুলি জীবনের ঐ পর্বে হয়ে উঠেছিল একেবারেই গুরুত্বহীন। অপরদিকে এই স্তরে তিনি নতুন করে প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করলেন, প্রকৃতির রমনীয়তা তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলল। জীবন স্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, "কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষন করিত। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত, এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।"[১৯]

কবির জীবনের এই পর্বে বিবাগী, শোকাতুর হৃদয়োপলব্ধির মধ্যেও, দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়েও এমন এক আকস্মিক আনন্দানুভূতি তাঁর হয়েছিল যাতে তিনি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, মৃত্যুর মধ্যে যেমন ক্ষতির দিক আছে তেমন লাভের দিকও আছে। এক অবিচল সত্যের পাথরে গাঁথা সংসারের কারাগারের কয়েদি আমরা কেউই নই। তিনি লিখেছেন, "সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবন মৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চালিয়াছে, সে ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়া ছিলাম।"[২০] তিনি উপলব্ধি করলেন, সাধারণ জীবনে আমরা জগৎ সংসারকে নিজেদের মধ্যে সম্পৃক্ত করে উপলব্ধি করি। কিন্তু জগৎ কে মনোহন সুন্দর বলে উপলব্ধি করতে হলে তাকে দূর থেকে উপলব্ধি করতে হয়। আর মৃত্যুই সেই দূরত্ব ঘটিয়ে দেয়। তিনি লিখেছেন, " আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরেণর বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।"[২১] কবি একধারে যেমন রাতের অন্ধকার আকাশের নীচে উপলব্ধি করলেন মৃত্যুর শূন্যতাকে, তেমন ভোরের সূর্য-স্নাত হৃদয়ে উপলব্ধি করলেন মৃত্যুর পূর্ণতাকে। যৌবনের রসসমৃদ্ধ জীবনে একান্ত আপনজন তথা দোসর এর অনাকাঙ্খিত আকস্মিক স্বেচ্ছামৃত্যু অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছিল কবিকে। এই আঘাত, এই শোক কবি সারা জীবন বয়ে বেড়িয়েছেন তাঁর গোপন হৃদয়ে। তাঁর এই 'পঁচিশ বছরের শোক' ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার তাঁর সৃষ্টিকর্মে। তাঁর মনে জাগিয়েছে নানা প্রশ্ন তাঁর কাছে জীবনটাই ছিল সত্য, আর যা সত্য তা চিরন্তন বলেই তাঁর বিশ্বাস। অথচ এক নিমেষে মৃত্যু এসে জীবনকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিয়ে গেল। এই মৃত্যু অবশম্ভাবী, অপরিহার্য্য তা যেন জীবনের চেয়েও বেশি সত্য বলে অনুভূত হতে লাগল। তা হলে কি মৃত্যু তথা শূণ্যতাই জীবনে একমাত্র সত্য ? বিনাশ তথা প্রলয়ই কি সংসার এর একমাত্র পরিণতি ? যে জীবন সংসারের আর পাঁচটা বস্তুর মতো একান্ত সত্য বলে উপলব্ধি হয় তা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যায় ? এসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কবি খুঁজে বেড়ালেন সীমার মধ্যে অসীমকে, শূণ্যের মধ্যে পূর্ণতাকে। না এর মধ্যে হ্যাঁ কে, অনস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্বকে। সংসার জগৎ জীবন সবই যদি

মিথ্যা হয়, শূণ্য হয় তাহলে সৃষ্টিইতো অর্থহীন হয়ে যাবে। তিনি উপলব্ধি করলেন মৃত্যুর পটভূমিতে সুন্দর জীবনকে। মৃত্যুর মধ্যে শত হাহাকার, বিচ্ছেদ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি একপ্রকার মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন চেতনার এই স্তরে। গভীর দুঃখের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এক বিচিত্র আনন্দ তথা সুখ কে। পাওয়া - না পাওয়ার মধ্যে এক অভূতপূর্ব সামঞ্জস্যকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, যা না থাকলে এই নিখিল বিশ্বের অনন্ত অস্তিত্ব সম্ভব হত না। মানব জীবন, জগৎ সংসার কোনোটিই অবিচল, নিশ্চল নয়, যা না পাওয়ার যন্ত্রণায় স্তব্ধ হয়ে যায়। শূণ্যতার মধ্যে পূর্ণতাই চরম সত্য ষ

পরবর্তী কালে জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের প্রয়াস কবিকে আরও দার্শনিক ভাবনায় সমাহিত করে রেখেছিল, আর তারই পাশে পাশে চলছিল সংসার জীবনের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। সদ্য (১৮৮৩) বিবাহিত তরুণ যুবক কবি তখন শরীরে মনে অবগাহন করছেন প্রেম আবেগ রোমাঞ্চকতার উষ্ণ প্রস্রবণে। সুখ - দুঃখ-মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল গভীর পত্নীপ্রেম। তারপর অনুভব করলেন পিতৃত্বের স্বাদ, মনে মধ্যে স্থান করেনিল অফুরন্ত সন্তান স্নেহ। কিন্তু তিনি অনুভব করছেন তাঁর মধ্যে দুটি পৃথক সত্তার দ্বৈরথ অনবরত তাঁকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তুলছে। একটি সত্তা তাঁকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা সত্তা তাঁকে কিছুতেই বিশ্রাম নিতে দিচ্ছে না।[২২] প্রকৃতই যদি কবি বিশ্রাম নিতেন সৃষ্টিকর্মে ইতি টানতেন তাহলে আমরা আর দার্শনিক আধ্যাত্মিক, ভক্ত, সাধক রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না, সৃষ্টি হত না 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'স্মরণ', 'খেয়া','নৈবেদ্য'র মতো কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ। বিশ্বের দরবারে লেখা হত না কোনো বাঙালী নোবেল জয়ীর নাম। বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে অস্ত যেত দিনের রবি।

এই পর্বে কবি একজন নির্ভর যোগ্য পরম আশ্রয়ের খোঁজ করতে গিয়ে সন্ধান পেলেন জীবনদেবতার। শিশুকাল থেকে উপনিষদ আত্মস্থ করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জগৎ তথা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি ও বিনাশের অধিকর্তা, 'ভূমা' তথা বিশ্বলোকের বিশ্বদেবতার। এবার তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর জীবনের অন্তরস্থিত দেবতা তথা জীবনদেবতার যিনি কখনো 'তুমি',কখনো 'নেয়ে' কখনো 'মাঝি' ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে। এই জীবন দেবতা বাউলদের 'মনের মানুষ' এর সঙ্গে তুলনীয়। মন যেমন ব্যক্তিভেদে অসংখ্য তেমন মনের মানুষ ও অসংখ্য কবি সৃষ্ট জীবনদেবতাও অসংখ্য, কবি মনে করতেন প্রত্যেক জীবনের দেবতাই একান্তভাবে সেই জীবনেরই দেবতা এবং তিনিই সকল প্রেরণার উৎস। এই জীবন দেবতা কবির মনে কখনো নারী, কখনো পুরুষ রূপে ধরা দিয়েছে। কবি তাঁকে অবগুন্ঠিতা, কৌতুকময়ী, সুন্দরী, রহস্যময়ী, কবি,বর, সখা, প্রিয় অন্তরতম ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছেন। তাকে বিদেশিনী রূপেও অনুভব করেছেন। কিন্তু তিনি যেই হোন না কেন তিনি কবির সারা জীবনের সাথী, এমনকি মৃত্যুর পরেও তিনি কবিকে তাঁর স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাবেন। তিনিই কবিকে এই জীবন লীলাভূমির মধ্যে এনে খেলাচ্ছলে রসের মেলার আয়োজন করেছেন বলে কবি উপলব্ধি করেছেন। কবি মনে করেন যাকে সবাই পরিত্যাগ করে যায় তাকেও জীবন দেবতা স্নেহভরা চিত্তে গ্রহণ করেন, তিনি সেই প্রাণময় যার সুধায় কবি বেঁচে আছেন, তিনি কবির কাছে যতটা পরিচিত ততটাই অপরিচিত তথাপি উভয়ের মধ্যে মিলনে কোনো বাধা নেই। আর এই জীবনদেবতার সঙ্গে একাত্মতাই কবিকে করে তুলেছে মৃত্যুঞ্জয়। এই জীবনদেবতা মৃত্যুর দেবতা। কবি লিখেছেন- "জীবনদেবতা মেটাফিজিক্যাল

জীবনদেবতা। আমার জীবনটিকে অবলম্বব করে যে অন্তর্যামী শক্তি আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলেছেন। ... মৃত্যুর পরে "সিন্ধুপারে" এই জীবন দেবতাই আমাকে চিরপরিচিত প্রিয় মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিলেন - আমি মিথ্যা ভয় করেছিলাম।[২৩] এই উপলব্ধি থেকেই কবির সিদ্ধান্ত -

"তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পরো অন্য পথ নাহি।"[২৪]

তিনি জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে আরও লিখলেন -

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা -
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম অসীমগগন বিহারী।"[২৫]

কবির উপলব্ধিতে জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা থেকে স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয়। বিশ্বদেবতা হলেন বিশ্বজনীন আর জীবনদেবতা হলেন ব্যক্তিগত। এক অভিন্ন আনন্দময় জ্যোতিস্মান অমৃতপুরুষ যেন ব্যক্তি ও বিশ্ব উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে চলেছেন। কবি একসময় জীবনদেবতাকে অতিক্রম করে বিশ্বদেবতার চরনতলে আশ্রয় নিয়েছেন।

কবির পরিণত বয়সে পরমিপ্রয় মানুষদের অকালমৃত্যু তাঁর রচনায় অত্যন্ত সংযত শান্ত, সমাহিত রূপে, প্রকাশ পেল। কোথাও কোন শোকোচ্ছাস নেই, হাহাকার নেই, বাঁধভাঙ্গা নয়ন বারিরও উল্লেখ নেই। মৃতাস্ত্রীর প্রতি তাঁর অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা যেন ঝরে ঝরে পড়েছে প্রতিটি কাব্যে। মৃত্যুর পর তিনি যেন তাঁর প্রেমিকাকে আরও নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন। তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে তাঁর মৃতা স্ত্রী যেন অবস্থান করছেন বলে তিনি অনুভব করছেন আর তাই কবির মনে কোনো শোক নেই। কবি 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের ১৯ নং কবিতায় লিখেছেন -

"জানি না কী করে
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে
মৃত্যু মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক -
ওই কথা মনে জানি নাই মোর শোক।"[২৬]

চবিবশ বছর বয়সে অনুভূত কবির একান্ত প্রিয়জন নতুন বৌঠানের মৃত্যুতে কবি হয়েছিলেন 'সৃষ্টিছাড়া', দুঃসহ দুঃখ তাঁকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখত। তিনি অন্ধকার আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝখানে খুঁজে বেড়াতেন তাঁর বৌঠানকে। আর একচল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি মৃতা স্ত্রী কে অনুভব করছেন নিজেরই মধ্যে। মৃত্যুর শূন্যতা তাঁর অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। কবির এই মৃত্যু চেতনার উত্তরণ সম্ভব হয়েছে তাঁরই দার্শনিক সুলভ মনোভাবের জন্য। যৌবনের রসোচ্ছাসের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে মৃত্যুর আবির্ভাব ও তার সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি তাঁকে এক উচ্চতর দার্শনিক চিন্তায় উন্নীত করেছিল। তিনি তাঁর ছোট্ট ঘরে যে অমৃতরসের স্পর্শ হারিয়ে ফেলেছিলেন তা খুঁজে পেলেন বিশ্বের অনন্ত অমৃতময় ধামে।

পরম প্রিয় কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে সন্তানহারা পিতা উপলব্ধি করলেন কোনো মৃত্যুই আনন্দময় জগতে কোন অভাব বা ক্ষতির সূচনা করতে পারে না। তাই তিনি লিখলেন, "তার পরের রাত্রে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই।"[১৫] বিশ্ব সংসারে গাছপালা, সাগর নদী, পাহাড় পর্বত, চন্দ্র-সূর্য সবই আপন দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে বা সংসার থেকে যা হারিয়ে যায় তা আশ্রয় নেয় জগৎ সংসারে বিশ্ব পিতার চরণে। তাই কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরেই হতভাগ্য পিতা নিরুত্তাপ কণ্ঠে গানের মহড়ায় যোগ দিতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বপিতার উদ্দেশ্যে লিখেছেন" -

তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।"[১৮]

উপনিষদীয় রসে পুষ্ট কবির হৃদয় সাংসারিক বাস্তবতাকে অতিক্রম করে নিবিষ্ট হয়েছে আধ্যাত্মিক তথা দার্শনিক জীবনে। কবি যখন স্ত্রী-কন্যা-পিতার মৃত্যুতে দেহ মনে বিধ্বস্ত তখন তাঁর একান্ত পরম আশ্রয় হলেন জীবনদেবতা রূপী ঈশ্বর। সংসারের কোনো মানুষের প্রতিই তিনি হয়ত আর নির্ভর করতে পারেননি অথবা চান নি। একে একে প্রায় সকলেই যেন তাকে ত্যাগ করে আশ্রয় নিচ্ছে পরম পিতার চরণকমলে।

কবি উপলব্ধি করলেন তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারা যায়। মৃত্যু মানে বিচ্ছেদ নয় আসলে জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন, যিনি আমাদের চিরসাথী, পরম আশ্রয়। যাঁর রাজ্যে কোথাও কোন দুঃখ, কোনো মৃত্যু, কোনো বিচ্ছেদ বিরহ যন্ত্রণা নেই। তিনি অসীম, অনন্ত, সুন্দর, শান্ত, পূর্ণ-ভাস্বর রূপে অবস্থান করেন। তাই মৃত্যুকে তিনি খেলা বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন - "আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা। নিশীথবেলা'[১৯] তাঁর মতে মৃত্যু নামক খেলার মধ্য দিয়ে সীমার সাথে অসীমের মিলনই মুক্তি। তাই মৃত্যুকে ভয় নয়, মৃত্যুকে জয় করাই শ্রেয়। এ জগৎ হল আনন্দময় ব্রহ্মের প্রকাশ। তাই মৃত্যু - দুঃখ-বিরহ-বিচ্ছেদ সকলেরই অন্তরালে আছে আনন্দ, শান্তি ও সৌন্দর্য্য। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা অমৃতের স্বাদ পাই। তাই মৃত্যুকে আপন করে নিতে কবির কোনো সংশয় হয়নি। দুঃখ কে তিনি ঘরের জিনিস, খাঁটি সঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দুঃখ আছে বলেই সুখের মহত্ব উপলব্ধ হয়। তিনি পার্থিব জীবনের দুঃখ, তাপ, শোক, মোহ থেকে উত্তীর্ণ করে জীবনকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক পরম আধ্যাত্মিক স্তরে যেখানে সর্বদা সত্য - প্রেম ও সৌন্দর্য্য সুধা বর্ষিত হয়। আমাদের জীবন তরী বয়ে চলেছে মৃত্যুরই অভিমুখে -এ এক অনিবার্য সত্য। তাই কবি মনে করেন মৃত্যুকে এড়িয়ে নয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মৃত্যুকে অতিক্রম করা এবং মৃত্যুকে জয় করার নামই জীবন। অতএব মৃত্যুকে জীবনের মতোই ভালোবাসতে হবে। অন্তের মধ্যেই আছে অনন্তের অধিষ্ঠান। মৃত্যু মানে পুরাতনের অবসান, জরার নাশ। জীবন যদি অমর হত তাহলে জরা-ব্যাধি-বার্ধক্যেরই জয়গান গাওয়া হত, নূতনের প্রবেশ দ্বার হত রুদ্ধ, মানুষ জীবনমৃত হয়ে বেঁচে থাকত। জগৎ জীর্ণতার ভারে নুইয়ে পড়ত। কিন্তু এই আনন্দ- অমৃতময় প্রকৃতিতে শুধুই নূতনের আবাহন। ফলের মধ্য দিয়েই ফুল পূর্ণতা লাভ করে আর ফল শাখা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাধনা করে। কারণ ফলের বিনাশে তার বীজ থেকে সৃষ্টি হয় নূতন গাছের। অতএব মৃত্যুই জীবনের সূচনা, প্রলয়ই সৃষ্টির

উৎস। তাই কবি বলতে পেরেছেন

"মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে। যে অন্তহীন প্রাণ।
..... আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে মেলায়
শান্তি সুমহান।" [৩০]

জীবন দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।" [৩১] কবি সুখের মাঝে যেমন সেই দেবতাকে দেখতে পেয়েছিলেন দুঃখের মধ্যেও তেমন তাঁকে প্রাণভরে উপলব্ধি করতে পেরে ছিলেন। তাই কবির রচিত জীবনদর্শন আজও আমাদের কাছে গবেষণাযোগ্য।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্মান - আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃঃ ১১৫ ।

২। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কবির কান্না, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

৩। রজতকান্ত রায়(সম্পাদক), জীবনদেবতা - বিশ্বভারতী প্রকাশনা,পৃঃ ১২৬।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতসংগীত জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃ ১৩৫।

৫। রবীন্দ্ররচনাবলী, বনফুল-২য় খন্ড, কামিনী প্রকাশনা, পৃঃ ৬২২।

৬। রবীন্দ্র রচনাবলী ,কবিকাহিনী - ২য় খন্ড , কামিনী প্রকাশনা,- পৃঃ ৫৬৮।

৭। রবীন্দ্র রচনাবলী,ভগ্নহৃদয় - তৃতীয় খন্ড, কামিনী প্রকাশনা, পৃঃ ২১৬।

৮। রবীন্দ্ররচনাবলী, উপহার - সন্ধ্যাসংগীত, দ্বিতীয় খন্ড, কামিনী প্রকাশনা,পৃঃ ৪৯।

৯। অশ্রুকুমার সিকদার, 'খেদের গান', উজ্জ্বল কুমার মজুমদার(সম্পাদক), রাতের তারা দিনের রবি, আনন্দ পাবলিশার্স,পৃঃ ৮৬।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,'জন্মদিনে- কবিতা সংখ্যা - ২৩, রবীন্দ্র রচনাবলী - ৭ম খন্ড, কামিনী প্রকাশনা,পৃঃ - ৮৭।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দৃষ্টি- সন্ধ্যাসংগীত , সঞ্চয়িতা সাহিত্যম্,পৃঃ ১৯।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ - প্রভাতসংগীত, তদেব,পৃঃ ২২।

১৩। প্রভাত উৎসব, তদেব,পৃঃ ২৩।

১৪। পুরাতন - কড়ি ও কোমল ,পৃঃ - ২৬, তদেব।

১৫। গীতোচ্ছাস, তদেব,পৃঃ ৩০।

১৬। মোহ, তদেব,পৃঃ ৩৫।

১৭। মরীচিকা, তদেব, পৃঃ ৩৫।

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৃত্যুশোক - জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃঃ ১৫৪।

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৃত্যুশোক - জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃঃ ১৫৪।

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৃত্যুশোক - জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃঃ ১৫৪।

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৃত্যুশোক - জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃঃ ১৫৪।

২২। ১৮৯৮ খ্রীঃ ২৯ শে জানুয়ারী প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বনবাস পর্ব - জীবেন্দ্র সিংহ রায় , রাতের তারা দিনের রবি, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার(সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স,পৃঃ ৯৪।

২৩ । রজতকান্ত রায়(সম্পাদক), জীবনদেবতা, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃঃ ৬৭ ।

২৪। রজতকান্ত রায়(সম্পাদক), জীবনদেবতা, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃঃ ১৪ ।

২৫ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেম পর্যায়, গীতবিতান, গান সংখ্যা, ৩৬।

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্মরণ - কবিতা সংখ্যা – ১৯, বিশ্বভারতী প্রকাশনা।

২৭।২৮ শে আগষ্ট ১৯৩২ এ মীরাদেবীকে লিখিত পত্র, চিঠিপত্র ৪র্থ খন্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃঃ ১৫২।

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্মরণ-কবিতা সংখ্যা - ২, বিশ্বভারতী প্রকাশনা।

২৯ । ঝুলন সোনার তরী, সঞ্চয়িতা – সাহিত্যম্,পৃঃ ১০৭।

৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী প্রকাশনা,পৃঃ ৬১।

৩১। রবীন্দ্র রচনাবলী,মানুষের ধর্ম, পঞ্চম খন্ড, কামিনী প্রকাশনা,পৃঃ ১০২৪।